আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮/১১/২০১৯

এনআরসি-র জন্য এ বার আদিবাসীদের দেশহীন হওয়ার পালা

এ দেশ কিন্তু তাঁদেরই ছিল

মানবেশ সরকার

১৮ নভেম্বর, ২০১৯

অসমে নাগরিক পঞ্জি থেকে বাদ পড়া ১৯ লক্ষ মানুষের মধ্যে এক বিরাট অংশ ‘বাঙালি হিন্দু’ জানার পর, ও-পার বাংলা থেকে আসা বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে এনআরসি আতঙ্ক বেড়ে গিয়েছে। জাতীয় নাগরিক পঞ্জি বা এনআরসি এখন আর শুধু মুসলমানদের নয়— হিন্দু, মুসলমান উভয়েরই আতঙ্কের বিষয়। তবে লক্ষ করার যে, বাংলাভাষীদের মধ্যে এনআরসি নিয়ে যে আলোচনা শুরু হয়েছে, আমাদের আদিবাসীদের মধ্যে তা অনুপস্থিত। অথচ অসমে নাগরিকত্ব হারানো ১৯ লক্ষ মানুষের মধ্যে শুধু আদিবাসী মানুষজনই হলেন এক লক্ষের ওপর। আসলে অন্যদের এনআরসি’র সম্পর্কে জানা-বোঝার যে সুযোগ আছে, আদিবাসীদের তা নেই। তা-ই এ নিয়ে তাঁদের আতঙ্কিত হওয়ার ‘সুযোগ’ কম, যদিও, পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি চালু

হলে নাগরিক পঞ্জি থেকে বাদ পড়া আদিবাসীর সংখ্যা খুব কম যে হবে না, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় 'নাগরিকত্ব' সভ্য জীবনযাপনের প্রাথমিক শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনও রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসবাসকারী এক জন মানুষকে 'নাগরিক' বলার অর্থ, রাষ্ট্রের কাছে তাঁর কিছু অধিকার স্বীকৃত হওয়া। যেমন, ভারতের সংবিধান ভারতের নাগরিকদের দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে কোনও জায়গায় যাওয়া বা বসবাস করার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের সে অধিকার নেই। সরকার সে স্বীকৃতি কেড়ে নিয়েছে। নাগরিকত্বহীন মানুষ কার্যত দেশহীন ও সভ্য ভাবে বাঁচার অধিকারহীন একদল মানুষ, যাঁদের বিদেশি বা অনুপ্রবেশকারী তকমা দিয়ে জেল বা ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া যায়।

ভারতে ১৯৫১ সালে এক বার নাগরিক পঞ্জি তৈরির উদ্যোগ করা হলেও সেই তালিকা নিয়ে বিতর্কের কারণে তা চাপা পড়ে যায়। নাগরিক পঞ্জি বানানোর বিষয়টি নতুন করে ফিরে আসে ২০০৩'এ। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে 'ন্যাশনাল রেজিস্টার অব ইন্ডিয়ান সিটিজ়েন্স', সংক্ষেপে এনআরসি তৈরির বিষয়টি নাগরিকত্ব আইনের আওতায় নিয়ে আসে। এই সংশোধিত আইনের প্রেক্ষাপটেই একটি জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ২০১৩ সালে অসমে নতুন করে নাগরিক পঞ্জি তৈরির নির্দেশ দেয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এই সংশোধিত আইনের ভিত্তিতেই সারা দেশের মানুষের উপর এনআরসি'র খাঁড়া নামিয়ে আনতে চাইছেন। প্রাথমিক ভাবে মুসলমানরা এর লক্ষ্য হলেও বাঙালি হিন্দু, গোর্খা, আদিবাসী কোনও সামাজিক পরিচিতির মানুষই এর বাইরে নন।

অসমে এনআরসি প্রক্রিয়া থেকে জানা যায় যে জমির দলিল, জন্ম সার্টিফিকেট, ভোটার তালিকায় নাম, শরণার্থী সার্টিফিকেট, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট, ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্ট-সহ মোট ১৪টি নথি নাগরিকত্ব প্রমাণের প্রামাণ্য নথি বলে

স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সম্প্রদায় নিরপেক্ষ ভাবে ভারতে এ রকম অসংখ্য মানুষ আছেন যাঁদের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য এই সব নথি যথাযথ ভাবে নেই। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ৫৯ বছর বয়সি এক বাঙালি হিন্দুর কথা ধরা যাক। ভারতের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী ১৯৮৭ সালের আগে কেউ ভারতে জন্মগ্রহণ করলে জন্ম সার্টিফিকেট দাখিল করতে পারলেই তাঁর নাগরিকত্ব প্রমাণ করা যায়। কিন্তু সেই ব্যক্তির জন্ম সার্টিফিকেট নেই, অন্য দিকে তাঁর বাবারও এমন নথি পাওয়া যাচ্ছে না, যা তাঁর নাগরিকত্ব প্রমাণে সহায়ক হতে পারে। ফলে তাঁর একমাত্র ভরসা ১৯৭১ সাল বা তার আগের ভোটার তালিকায় তাঁর বাবার নাম থাকা। নথি সংক্রান্ত নানা সমস্যা থাকার কারণে নাগরিকত্ব হারানোর দুশ্চিন্তা অনেককেই গ্রাস করতে শুরু করেছে।

তবে বেশির ভাগ আদিবাসী এই দুশ্চিন্তার মধ্যে নেই, কারণ তাঁরা এত সব জানা-বোঝার অবস্থাতেই নেই। অসমের চা-বাগানের আদিবাসীরা এ কথাও বলেছেন যে, যত দিন চা-বাগান থাকবে কেউ তাঁদের তাড়াতে পারবে না। কিন্তু বিশ্বাসটা যে কত ভুল তা সুপ্রিম কোর্টের ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯-এর একটি রায় থেকে স্পষ্ট: 'অরণ্য অধিকার আইন ২০০৬'এর বাস্তবায়ন সম্পর্কিত এই রায়ের নির্দেশ, জঙ্গলের জমির পাট্টার জন্য বনাঞ্চলে বসবাসকারী যে পরিবারগুলির আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে, তাদের অবিলম্বে জঙ্গল থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। সরকারি হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে সারা দেশে এমন পরিবারের সংখ্যা ১৭ লক্ষ (মোট আবেদনের ৪২ শতাংশ), যারা বনবিভাগের অধীনে থাকা তাদের জমির উপর আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। কলমের এক খোঁচায় বংশপরম্পরায় জঙ্গলে বসবাসকারী এই সব আদিবাসী পরিবারের অনেকেই ভিটেমাটি হারাবেন। যে আদিবাসীরা এখনও রাষ্ট্র ও তার আইন-কানুন থেকে অনেকটাই দূরে, তাঁদের জঙ্গলের জমির উপর আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা করাটা যে মোটেই সহজ কথা নয়, এ কথা জানতে পণ্ডিত হতে হয় না। খাড়িয়া সম্প্রদায়ের যে আদিবাসী মানুষটি সিমলিপাল জঙ্গলেই জন্মেছেন; মধু, ধুনা ও অন্যান্য জঙ্গলসম্পদের উপর নির্ভর করেই যিনি বাঁচার চেষ্টা করেন; জঙ্গলে বাসের অধিকারকে যিনি তাঁর প্রকৃতিপ্রদত্ত অধিকার বলেই ভাবতে অভ্যস্ত; জঙ্গল কারও

ব্যক্তিগত নামে হতে পারে, এ ধারণাটাই যাঁর মাথায় নেই; আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যাঁর যোগ নেই বললেই চলে; তাঁকে জঙ্গলের জমির পাট্টার জন্য আবেদন করে আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে বলার অর্থ কী, তা সহজেই অনুমেয়। আদিবাসীরা যদি আধুনিক রাষ্ট্রের আইনের সঙ্গে জুঝবার ক্ষমতাই রাখতেন তবে তাঁদের জমি বে-দখল হয়ে যাওয়ার ইতিহাসই গড়ে উঠত না। আদিবাসীদের প্রকৃতিপ্রদত্ত অধিকার তখনই আইনি অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যখন রাষ্ট্র তা নিয়ে ভাবে। কিন্তু, রাষ্ট্র সে ব্যাপারে কতটা মনোযোগী, তা এশিয়াটিক সোসাইটি ও প্রতীচী ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক সমীক্ষা থেকেই বোঝা যায়। এই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ আদিবাসীই এই আইনটি নিয়ে কিছু শোনেননি। জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল আদিবাসী উত্তরদাতাদের মাত্র ১৪ শতাংশ এই আইন সম্পর্কে কিছু জানেন বলে দাবি করেছেন। ফলে 'অরণ্য অধিকার আইন'-এর সুবিধা নিয়ে বনবিভাগের অধীনে থাকা জমির উপর নিজের বা সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, পশ্চিমবঙ্গে এর জন্য আবেদন করার লোকও ছিল হাতে-গোনা। ভারতের অনেক রাজ্যই এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলাদা কিছু নয়।

'অরণ্য অধিকার আইন'-এর যদি এই পরিণতি হয়, তবে এনআরসি আদিবাসীদের জন্য কী পরিণতি নিয়ে আসছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অরণ্যচারী যে আদিবাসী কোনও দিন জমির কাগজপত্রের কথাই ভাবেননি, তাঁকে যদি নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য জমির কাগজ হাতড়াতে হয়, উচ্চশিক্ষার অভাবে যে আদিবাসীর দিনমজুরের কাজ ছাড়া অন্য কোনও পেশায় যাওয়ার কথা ভাববার অবকাশ নেই, তাঁকে যদি নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের কথা বলা হয়, যে আদিবাসীদের ভোটকেন্দ্রে যেতে পারাটাই একটা সমস্যা তাঁদের যদি ১৯৭১ বা তার পূর্ববর্তী সময়ের ভোটার তালিকায় নাম খুঁজতে সরকারি অফিসে যেতে হয়, তবে আর যা-ই হোক— আদিবাসীর নাগরিকত্ব প্রমাণ করা সহজ নয়। তাই অসমে যে বড়ো সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা সাঁওতালদের বহিরাগত বলে আক্রমণ করেছিল, সেই বড়োদেরই ২৫০০০ মানুষ বর্তমানে এনআরসি থেকে বাদ— বহিরাগত ছাপ তাঁদের জুটল বলে! উপযুক্ত

নথির অভাবে পশ্চিমবঙ্গে বনবস্তিতে বসবাসকারী রাভা বা জঙ্গলে বসবাসকারী খাড়িয়া বা লোধা সম্প্রদায়ের আদিবাসীরাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত হবেন। চা-বাগানের আদিবাসীরা অভাবের তাড়নায় ব্রিটিশ আমলে তাঁদের ভিটেমাটি ছেড়ে ঝাড়খণ্ড বা তার আশেপাশের রাজ্য থেকে অসম বা উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে কাজ করতে এসেছিলেন, প্রায় কারও নিজের জমি নেই, চা-বাগানের কোয়ার্টার বা চা-বাগানের খালি জমিতে ঘর তৈরি করে তাঁদের বসবাস। ফলে নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য জমির দলিলের অভাবে এঁদের অনেকেরই বাসস্থান সার্টিফিকেটের উপরই নির্ভর করতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে পরিস্থিতি কতটা কঠিন।

'অরণ্য অধিকার আইন'-এর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অন্তত আদিবাসীদের বিরুদ্ধে ঘটা ঐতিহাসিক অন্যায় দূর করার কিছুটা নৈতিক দায়িত্ব নিয়েছিল। কিন্তু এনআরসি'র ক্ষেত্রে? রাজনৈতিক ব্যর্থতার দায় সে নাগরিকদের উপর ন্যস্ত করেছে। নাগরিক তার নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে না পারলেই হয়ে পড়বে অনুপ্রবেশকারী। আদিবাসীদের 'উদ্বাস্তু' হওয়ার তুলনায় উচ্ছেদ হওয়ার অভিজ্ঞতা তীব্রতর। দেশহীন হওয়ার থেকে দেশান্তরী হওয়ার অভিজ্ঞতা সমধিক। এ বার হয়তো তাঁদের দেশহীন হওয়ার পালা।